গণ আন্দোলনের প্রথম চিত্রকর – চিত্তপ্রসাদ

চিত্তপ্রসাদের জন্মশতবর্ষে তাঁকে নতুনকরে স্মরণ করলেন দেবকুমার সোম। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়।

আমাদের উপমহাদেশে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের গর্ভ থেকে যখন বুর্জোয়িত সমাজের জন্ম হল, তখন অর্থনৈতিক উপদানগুলোর সঙ্গে আমাদের লৌকিক শিল্প-সংস্কৃতিও হল বাস্তুচ্যুত। শিল্প-সাহিত্য হল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিনোদনের বিষয়। চাঁদবেনের মঙ্গল সাহিত্যের জায়গা নিল 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি' নভেল; পাঁচালি-পালাগানের বদলে থ্যাটার। নাটমন্দিরের রামপ্রসাদী নয়, বৈঠকখানায় 'সখী ভাবনা কাহারে বলে'। আমাদের দেশজ পটচিত্র, আলপনা, কাঁথা কিংবা কাঠ খোদাইয়ের ভূগোল হল অপহৃত। এল পেনটিং, নিসর্গ চিত্র, বিত্তশালী ও খ্যাতমান মানুষের পোর্ট্রেট, নগর স্থাপত্য চিত্র এইসব। নবজাগরণ, বিলেতপ্রেম, ড্রয়িংরুম মানসিকতা কর্কটরোগের মতো ছেয়ে গেল সংস্কৃতির কৃত্রিম মাটিতে। আমরা শেকড়চ্যুত হলাম। আমরা বেশ ভদ্দরলোক হয়ে উঠলাম।

আত্মপ্রতিকৃতি : কালিকলম, ১৯৬০

এবং এইভাবে ক্রমে আমাদের লোকায়ত শিল্প কোনঠাসা হল। সে হল ছোটলোকের সংস্কৃতি। ভিকতোরিয়ান মাপকাঠিতে অপ্ প্রত্যয় যোগে সংস্কৃতি। ভদ্দরলোকের শিল্পচর্চায় ক্রমে পুঁজির বিকাশ দেখা দিল। বিবিধ ও বিচিত্র টেকনিক সর্বস্ব চিত্রকলায় সবকিছুই হল দৃষ্টিসুন্দর, মনোরম, প্রদর্শিত। শ্রমজীবী মানুষের শিল্পের দিন গেল, সন্ধ্যাও হল। অথচ, পার করার কেউ রইল না।

এই অবস্থা বদলাতে, অর্থাৎ ভদ্দরলোকেদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি অপেক্ষা ছাড়া আমাদের অন্য গতি ছিল না। উনিশশো পঁয়ত্রিশে পূর্ণচন্দ্র যোশী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার পরে পরিস্থিতির, ভাবনার, দৃষ্টিভঙ্গীর গুণগত পরিবর্তন ঘটল। তিনি সচেতনভাবে সাংস্কৃতিক জগতের মানুষদের উৎসাহ দিলেন, শিল্পকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। আর্ট ফর আর্ট সেক নয়। শিল্প তার শিকড়ের

সন্ধান করবে এই ছিল যোশীর অভিপ্রায়। অনেক ভ্রান্ত নীতির আবিষ্কারকর্তা হলেও পি.সি. যোশীর অনুপ্রেরণায় সাতচল্লিশ অবধি গণনাট্য সংঘ দেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবীর প্রধান কর্মস্থল ছিল। সে ছিল এক উত্তাল সময়। একদিকে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ। অন্যদিকে রাশিয়ার উজ্জীবন। তখনকার কম্যিউনিস্ট পার্টির মনে হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ প্রশস্থ হলে বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত জমি পাওয়া যাবে। ফলে সেকালে বিভিন্ন গণআন্দোলন, তা সে তেভাগা হোক, কিংবা তেলেঙ্গানা; বাংলার দুর্ভিক্ষ অথবা মুম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ, সর্বাগ্রে সাংস্কৃতিক কর্মীরা রাজনৈতিক কর্মীদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। চিত্তপ্রসাদ ছিলেন তেমনই এক গণআন্দোলনের চিত্রকর। চিত্তপ্রসাদ ছিলেন যোশীর আবিষ্কার। তাঁর প্রেরণা ছিল সোবিয়েত সমাজতন্ত্র, তাঁর অন্তরে ছিলেন যোসেফ স্তালিন। সে-সব সাঁইত্রিশ সালের কথা, তার আগের চিত্তপ্রসাদ সম্পর্কে সামান্য কিছু বাক্যব্যয় নিতান্ত দরকারি।

চিত্তপ্রসাদের গর্ভধারিণী ইন্দুমতি দেবী ছিলেন স্বল্পখ্যাত কবি। সে যুগে তিনি কেবল কবিতা রচনা করতেন না, ঘরদোর সামলে ব্রতচারি সংঘের কর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। ছেলেপুলেদের সঙ্গীত, নাচ, চিত্রকলা, সাহিত্যে উৎসাহ দিতেন। সেই ছেলেবেলায় চিত্তপ্রসাদ জেনেছিলেন তাঁদের পরিবারের 'মক্কা' হল শান্তিনিকেতন। আর 'প্রফেট' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। উনিশশো বত্রিশে আই. এ. পরীক্ষার সময় চট্টগ্রামের সমর দাশগুপ্তের মধ্যস্থতায় মুম্বাইবাসী চিত্রকর নন্দলাল-ছাত্র রমেন চক্রবর্তী শান্তিনিকেতনে চিত্তপ্রসাদের শিল্পশিক্ষায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। নন্দলালকে এতদিন নিভৃতে গুরু মেনে চিত্তপ্রসাদ যে পটের ছবিগুলো এঁকেছিলেন, নন্দবাবু সেগুলোর প্রশংসা করলেন বটে, তবে তাঁকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন না। ব্যথিত, অপমানিত (?) কিশোর শিল্পী পরাহত ফিরে গেলেন স্বভূমি চট্টগ্রামে। তখন তিনি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

এল উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল। চট্টগ্রাম গণ অভ্যুত্থানের বিপ্লবীদের কয়েকজন আন্দামানের জেল থেকে ফিরলেন। ততদিনে তাঁরা মেটামরফসিসড্। তখন তাঁরা কমিউনিস্ট। মা ইন্দুমতি চেয়েছিলেন তাঁর বড়োখোকাটি যেন শিল্পী হন। আর সত্যিই সেই তিরিশ দশকের চট্টগ্রাম শহরে চিত্তপ্রসাদের চিত্রকর হিসেবে হাঁকডাক কিছু কম ছিল না। তাঁর ওপর আর্য সঙ্গীতসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সম্ভাবনা ছিল, আহ্বান ছিল বুর্জোয়িত শিল্পচর্চার কপাটহীন দুয়ারের। তখন খ্যাতবান হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু চিত্তপ্রসাদ কোন শিল্প বিদ্যালয়ের গ্রোডাক্ট ছিলেন না। নন্দবাবুর অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের পরে নতুন করে কোন শিল্পগুরু খুঁজতে তাঁর প্রকৃতগত কারণেই অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল। অন্যদিকে কমিউনিস্ট ভাবধারায় যারা সক্রিয়, তাঁদের উষ্ণ সান্নিধ্য, চিন্তার ঔদার্য, পড়ুয়া মেধা তাঁকে ঘর থেকে টেনে বের করার পরিকল্পনা করল। ফলে মায়ে-পোয়ে দ্বৈরথ। ইন্দুমতির এতদিনের স্বপ্নকে পথে ফেলে, ভট্টাচার্য পদবি ছেঁটে চিত্তপ্রসাদ হলেন যোশী ছায়ানুসারী।

সাঁইত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ সি.পি.আই.-য়ে যোশীযুগ। সেই বিশেষ দশটি বছরে দেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে চিত্রকর হিসেবে চিত্তপ্রসাদের অবশ্যম্ভবী উপস্থিতি। কালি-কলমে শ্রমজীবী মানুষের ছবি আঁকছেন। তারা গরীব দেশের পরাধীন শ্রমজীবী যেন নয়। বলিষ্ঠ তাদের মুঠো, দৃষ্টিতে বিদ্রোহ। তারা ক্লীব কিংবা নিরন্ন নয়, তারা আগামী বিপ্লবের সহযাত্রী। প্রথম পার্টি কংগ্রেসের পোস্টার, মঞ্চায়ণ করলেন। নেহরু, গান্ধী, যোশীর কাট-আউট করলেন। গান্ধীর আশ্রমিক মূর্তি, সর্দার ভগৎ সিং-এর পোর্ট্রেট। এই সময় খুব দ্রুত এবং সস্তায় আরও ছবি তৈরি করতে চেয়ে গ্রাফিক্স আর্টে মন বাঁধা পড়ল তাঁর। যখন সমসাময়িক শিল্পীরা ক্যানভাস, ইজেল, তেলরঙ, প্যাস্টেলে কাজ করছেন, তখন শ্রমজীবী মানুষের জন্য যে শিল্প, সেই শিল্প রচনায় চিত্তপ্রসাদ ছাপ-চিত্রে নিজেকে ঢেলে দিলেন। লিনোকাট, উডকাটের কাজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মুম্বাই থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ। পাঞ্জাব থেকে বিহার। মোলায়েম নিসর্গ চিত্র নয়, প্রতিটি ছবিই রাজনৈতিক।

এল ভারতছাড় আন্দোলন, বাংলায় মানুষ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, শুরু হল নৌ-বিদ্রোহ। চিত্তপ্রসাদ তাঁর অন্য সতীর্থদের মতোই ছুটে গেলেন মেদিনীপুর। সাদা-কালোয় চিত্রিত হতে লাগল নিরন্ন মানুষ। পার্টির মুখপত্রে প্রতিবেদন সহ ছাপা হল। সারা দেশ উত্তাল হল। চিত্তপ্রসাদের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো আমাদের চেনালো ক্ষুধা একমাত্র যন্ত্রণা নয়। বরং আসন্ন মৃত্যু ক্ষুধার চেয়েও ভয়াবহ কোন সত্য।

সাতচল্লিশে যোশীকে সরিয়ে রনদিভে হলেন সি.পি.আই.-এর জেনারেল সেক্রেটারি। ফলে যোশী লাইন পার্টিতে বাতিল হল। গণনাট্য সংঘ, অন্যান্য গণআন্দোলনগুলোর ওপর থেকে পার্টির সহায়তা উঠে গেল। যে প্রবল বিস্ফোরণের মতো ফ্যাসিস্ত বিরোধিতা, কংগ্রেস তথা বুর্জোয়া বিরোধিতা, তার অভিমুখ হঠাৎই দিশা হারাল। ফাঁপরে পড়লেন চিত্তপ্রসাদ। তাঁর অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত পার্টির এই সিদ্ধান্ত।

চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে গণনাট্য সংঘে যারা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নন-পলিটিক্যাল ইন্টেলেকচুয়াল। এরা ছিলেন আর্ট কলেজের প্রোডাক্ট, পার্টির বিভিন্ন প্রোগামে যেমন তাঁরা থেকেছেন, তেমনই বুর্জায়িত শিল্পের চর্চাও করে গেছেন। ফলে পার্টি যখন যোশী লাইন বর্জন করল, তখন তাঁদের পক্ষে নেহরুগামী হওয়া বিবেক দংশনের কারণ ছিল না। বেঁচে থাকার স্বার্থে, নিজের শিল্পচর্চার স্বার্থেই তাঁরা ক্রমে ললিতকলা, সাহিত্য অকাদেমি, এন.বি.টি.-তে নাম লেখালেন। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ তো পেলেনই। কেউ কেউ ভারতরত্ন কিংবা দাদা সাহেব ফালকে। চিত্তপ্রসাদ ছিলেন আপাদমস্তক একজন পার্টিকর্মী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যোশীর অপসারণে তিনিও পার্টি ছাড়লেন বটে, ছাড়লেন না তাঁর আন্ধেরির বাসা। প্রত্যাখ্যান করলেন নেহরুর এন.বি.টি.তে আমন্ত্রণ। থেকে গেলেন চিরকালীন গণআন্দোলনকর্মী। কারণ, তাঁর ছবির দর্শন দাঁড়িয়ে ছিল প্রলেতেরিয়েত শিল্পকলার মাটিতে।

অস্তিত্বের সংকটমোচনে চিত্তপ্রসাদের হাতে গ্রাফিক্স চিত্র ছাড়া আর কিছু ছিল না। অতীতদিনের কিছু ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বিষয়ে। কৈশোরের চিত্তপ্রসাদ যেমন নন্দলাল বসুর চোখের ভাষা পড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন, মধ্য যৌবনের চিত্তপ্রসাদও তেমনই ব্যর্থ হয়েছিলেন কমরেডদের চোখের ভাষা পড়তে। ফলে তাঁর সেই বিখ্যাত বন্ধুদল, আরও বিখ্যাত হওয়ার লোভে চিত্তপ্রসাদকে একরকম পরিহার করলেন। পরিহাসও। এ ছোট্ট আলোচনায় সেইসব কৃতঘ্ন কৃতব্যক্তিদের নাম উচ্চারণ করতে চাই না। তাঁরা আমাদের নমস্য। আগ্রহীজন চিত্তপ্রসাদের চিঠিপত্র পাঠ করলে কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন।

ফলে চিত্তপ্রসাদ কী সিদ্ধান্ত নিলেন? কমরেডরা সরে গেলেও যাদের জীবন তাঁর ছবির বিষয়, চিত্তপ্রসাদ তাদের মধ্যে মিশে গেলেন। তৈরি করলেন পুতুলনাচ, শুরু হল পাপেট। লিনোকাটে আঁকলেন গাঁ-গেরস্তের জীবন, আঁকলেন তেলেঙ্গানা। তৈরি হল তেভাগার ওপর ছবি। সৃষ্টি করলেন রূপকথাহীন শৈশব। কিংবা আশ্রয় নিলেন মহাকাব্যের নবভাষ্য নির্মাণে। আর এভাবে দক্ষিণ ভারতে জেগে ওঠা কৃষক বিদ্রোহের তিনি হলেন উদগাতা। তাঁর ছবি ছড়িয়ে পড়ল রুমানিয়া, জার্মানি, রুশদেশে। বিদেশের আর্ট গ্যালারি নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশের গণআন্দোলনের সমাজ আবিষ্কার করল তাদের দোসর নিরন্ন, অভাবী কিন্তু প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর একজন গণআন্দোলনের শিল্পীকে। চিত্তপ্রসাদের ছবিতে নিজেদের অবস্থান চিনলেন চেরাবান্ডা রাজু, গদার, ভারভারা রাও, কোবাড গান্ধী।

সংসার তিনি কখনও করেননি। তারা যাজ্ঞিক আর তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বাংলা কিংবা মহারাষ্ট্রে তাঁরই নিকট কমরেডদের গসিপের শেষ ছিল না। অথচ চিত্তপ্রসাদ ছিলেন সংসার উদাসীন এক শিল্পী। জীবনের উপান্তে বন্ধুজনের বিশ্বাসঘাতকতা আর শারীরিক অবস্থার অবনয়ন তাঁকে কলকাতায় ফেরায়।

কলকাতা কিংবা বাংলা কখনই চিত্তপ্রসাদকে সসম্মানে গ্রহণ করেনি। এর প্রধানতম কারণ তিনি ছিলেন বাংলার কমিউনিস্টদের ভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের লোক। দুই, মুম্বাই বাসের ফলে বাংলার শিল্পীসমাজের কোন একটি বিশেষ শিবির আশ্রিত না হওয়া। আর তিন নম্বর, সম্ভবত সবচেয়ে জোরালো কারণ, আমৃত্যু একজন সাচ্চা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে মানুষের জন্য শিল্পরচনার তাগিদ। এ আমাদের পরম পাওয়া যে তিনি কখনও শিল্পের নামে অ্যাবস্ট্রাক্ট রচনা করেননি। কখনও আর্টের নামে নিজের রাজনৈতিক সত্ত্বার সঙ্গে করেননি বেইমানি।

এই জন্মশতবর্ষে চিত্তপ্রসাদের প্রাসঙ্গিকতা নেই। অন্তত এই বাংলায়। এক সময় রোমান্টিক বিপ্লবের চোঙা ফুঁকে বাঙালি যুবকেরা শহীদ হয়েছেন। তাঁদের দোসর ছিলেন চিত্তপ্রসাদ। আজ তাঁদের শহীদবেদীগুলো ফুটপাতের শনিমন্দির কিংবা মাছের বাজারের শানে অবনত। আজকের প্রজন্মের কাছে তিনি কোন অনুপ্রেরণা নন। অন্তত, এই মূহুর্তে তার

জীবন অনুসরণের প্রাসঙ্গিকতা মুছে গেছে। এখন চিত্তপ্রসাদ অ্যাকাডেমিক। দৃষ্টিকটূভাবে অ্যাকাডেমিক ব্যক্তিত্ব। সরোজ দত্ত'র কবিতা অনুসরণ করে বললে বলা যায় – 'মরিয়াছে ব্যাটা / চুকিয়াছে ল্যাঠা / এবারে ব্যাটারে বানাও ধর্মবাপ / মনসার পুজো ঢের বেশি ভালো / কে চায় পূজিতে জ্যন্ত সাপ।' এখন যে চিত্ত প্রকাশের যুগ নয়, চিত্র প্রসারের যুগ। ক্ষমতাবানের অপটু হাতের আঁচড়ে এখন না হয় রক্তাক্ত হোক ক্যানভাস। আমরা সমবেত ভদ্দরজন ঢেঁকুর তুলে না হয় বলি – চি-ত্তো-পো-সা-দ! সেটা আবার কে রে?

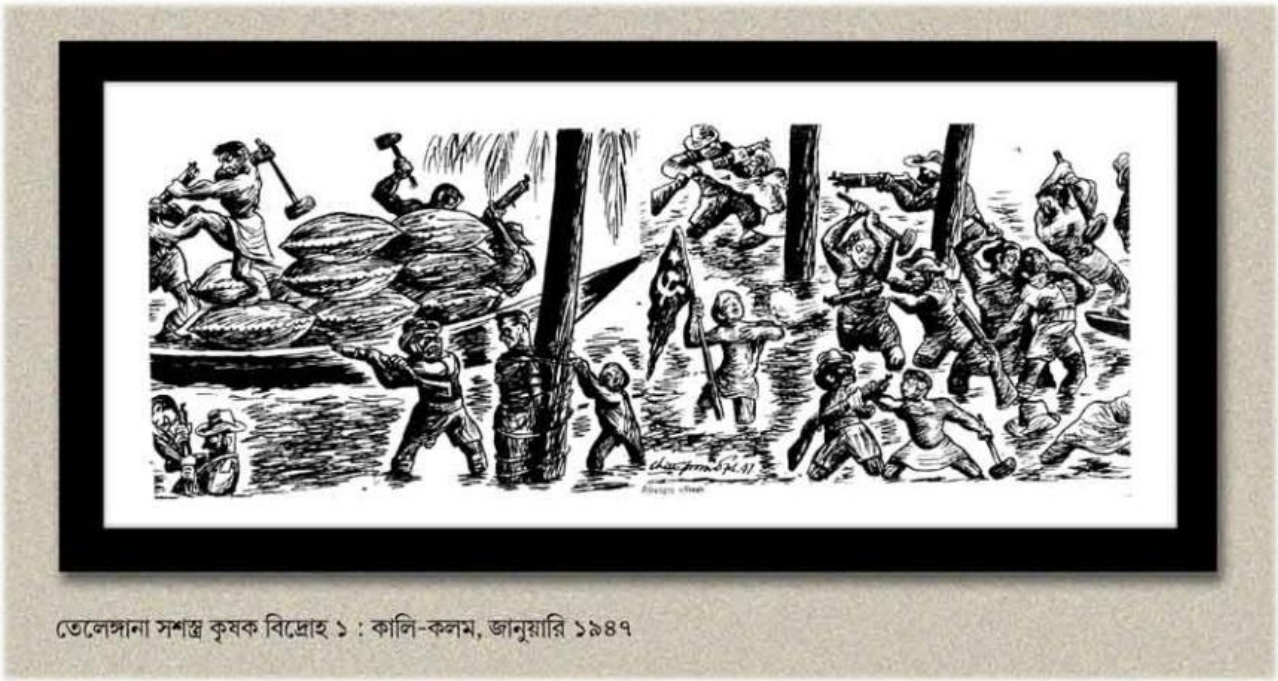

তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ ১ : কালি-কলম, জানুয়ারি ১৯৪৭

চিত্র পরিচিতি : ১। চিত্তপ্রসাদের আত্মপ্রতিকৃতি; ২। তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ : শিল্পী – চিত্তপ্রসাদ